তমাল একা একা পুড়ে যাচ্ছে

নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়

১৪ এপ্রিল, ২০০১, সকাল ৭টা ২০মিনিট

চোখ বুজে প্রচেত দেখতে পেল নির্জন অন্ধকারে তমাল একা একা পুড়ে যাচ্ছে।.....যন্ত্রণার কোন্ তীব্রতায় পৌঁছলে ২১ বছরের একজন যুবক প্রথমে নিজের শরীরে এক বোতল কেরোসিন ঢেলে দ্যায়; তারপর জীবন, সমাজ ও সময়ের প্রতি প্রগাঢ় অভিমানে; অপমানে-বোধের গরলের জ্বালায় ছটফট করতে করতে; ভয়ঙ্কর শারীরিক বেদনাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে নিজের হাতে একটা দেশলাই-কাঠি জ্বেলে ছুঁড়ে দিতে পারে নিজেরই ভেজা শরীরে!.....

বহুতল বাড়ির সিক্সথ্-ফ্লোরে, দামী আসবাবপত্র সাজানো এক নিরাপদ ঘরের আরামে বুঁদ প্রচেত চোখ বুজে বারবার শুধু দেখছিল অজস্র সাপের মতন হিংস্র, লোলুপ এবং লেলিহান অগ্নিশিখায় নিশ্চুপ, দ্বিধাহীন, অসমসাহসী তমাল কীভাবে পুড়িয়ে মারছে নিজেকেই! আর দৃশ্যটা লাগাতার কল্পনা করে প্রচেত নিজেই শিউরে উঠেছিল। একটা তাজা শরীরকে অনাবিল আনন্দে পুড়িয়ে দিচ্ছিল যে বিধবংসী আগুন; সেই আগুনের আঁচের তীব্রতা প্রচেতও যেন এই মুহূর্তে অনুভব করছিল তার নিজের শরীরে, মনে .....।

আজকের সংবাদপত্র সোফার একপাশে, (প্রচেত যেখানে বসে আছে), ডানা-ভাঙা পাখি। ঐ সংবাদপত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠায়, নীচের দিকে, বাঁ-দিকের কলামে খবরটা। যা প্রচেত এইমাত্র পড়েছে।... ইউথ কমিটস্ সুইসাইড — ।

এই শহরের এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অফিসার অদিতি সেন নিজেই চা-এর কাপ-প্লেট হাতে ঢুকল এ-ঘরে।

— এই নাও চা। — অদিতির এক হাতে চা-এর কাপ-প্লেট এবং অন্য হাতে প্লেটে বিস্কুট থাকায় প্রচেত সোফায় এলিয়ে বসে-থাকার মুদ্রা বদলে নিল। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে সে, প্রচেত, ডান হাত বাড়িয়ে ধরল বিস্কুটের প্লেট। চা অদিতি নীচু হয়ে রাখল ছোট টেবিলের ওপর। অদিতির পরনে এই ভোরে শুধুই স্বচ্ছ, মেন, আলগা নাইটি। নাইটির নীচে আর কোনও অন্তর্বাস নেই। ফলে এই মুহূর্তে প্রচেতের চোখে অদিতির সযত্নে রক্ষিত শরীরের নয়নমোহন ভাস্কর্য, বিপজ্জনক রেখা ও বাঁকগুলো বেশ স্পষ্ট।

— দাঁড়াও আমার চা নিয়ে আসি। — অদিতি বেরিয়ে গেল। প্রচেত ভাবছিল। ..... ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ চাকুরে অদিতির এই ফ্ল্যাটে, যতদূর জানে প্রচেত একাধিক কাজের লোক। একজন বিধবা মহিলা সবসময়ের জন্যে এ-বাড়িতে থাকে। ঘরদোর গুছিয়ে-রাখা, রান্নাবান্না তার কাজ। এ ছাড়াও বোধহয় একজন ঠিকে ঝি। কিন্তু প্রচেত যখনই রাত কাটাতে আসে অদিতির বাড়িতে; কাজেক লোকেদের ছুটি দেয় অদিতি। ভেবে দেখেছে প্রচেত দুটো কারণ। অদিতি নিশ্চয়ই চায় না এই যে প্রচেত এ-বাড়িতে মাঝে মাঝে রাত কাটায়, সহবাস করে স্বামী-স্ত্রীর মতন দুজনে, — তা কাজের লোক মারফৎ মুখরোচক খবর হয়ে এই আবাসনের অন্য বাসিন্দাদের কাছে ছড়িয়ে যাক। দ্বিতীয়ত, (এটা প্রচেতের কল্পনাও হতে থাকে), — সামাজিক অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে এই যে অদিতি প্রচেতকে নিয়ে তার এক বা দুই দিনের স্পল্পস্থায়ী খেলাঘর গড়ে নেয়, যেখানে, সেই বিজন ঘরে সে, অদিতি পরপুষের সঙ্গে তার সমরাগময় ওঠাবসা; তার একান্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলো আসলে আমূল উপভোগ করতে চায়। অন্য কোনও অযাচিত উপস্থিতি অদিতির সেই নিজস্ব উপভোগ্যতায় ব্যাঘাত ঘটাক — এটে সে চায় না।.....

নিজের চা-এর কাপ নিয়ে অদিতি এ-ঘরে ফিরে এসেছে। প্রচেত ও অদিতি দুজনেই এখন চা-এ চুমুক। প্লেট থেকে চিজলিং বিস্কুটও প্রচেত নিয়েছে কয়েকটা।

— তুমি যে ভেবেছিলে বাড়িতে আজ সকালে একবার ফোন করবে। অদিতি বলল। — তোমার সতী-সাধবী বউ-এর খোঁজ নেবে? অদিতির শ্লেষের ধারালো তীর গায়ে ফুটল না প্রচেতের। কিংবা বলা যায় তীরটিকে সে অগ্রাহ্য করল।
— হ্যাঁ। ভালো মনে করেছ। ...দীপাকে একটা ফোন করা উচিত।
— তুমি কথা বলে নাও। আমি আসছি। — অদিতি আবার পাশের ঘরে। সোফার আরাম ছেড়ে উঠতে হয় প্রচেতকে। এ-ঘরে দেয়ালের ব্র্যাকেটে ঝোলানো নিজের শার্টের বুক-পকেট থেকে খেলনা-সদৃশ, ঝাঁ-চকচকে সেল-ফোনটা তুলে নেয় সে। তারপর বোতাম টিপে নিজের বাড়িতে ডায়াল করে।
বেজে যাচ্ছে ফোন।
দীপা এখন কোথায়? ..... চান ঘরে? ..... নাকি ঘুম থেকে ওঠেনি এখনও? ..... তাই কী হয়? .....সকাল সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। অথচ দীপা এখনও বিছানার ওম-এ; উনিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে প্রচেত এটা কল্পনা করতে পারে না। বরং দীপা, — কী যেন বলে ..... সেই কাক-ভোরে বরাবর বিছানা ত্যাগ করে। স্নান সারে। তারপর টাটকা জামাকাপড় প'রে (দীপার ভাষায়) — তার ঠাকুরকে জল দ্যায়। ঠাকুরকে না জল দিয়ে দীপা কোনওদিন সকালবেলা তার উপোস ভাঙে না।
— হ্যালো....? — মিহি গলা দীপারই।
— .... আমি বলছি। .... সব ঠিক আছে তো?
— হ্যাঁগো হ্যাঁ। সব ঠিক আছে। অফিসের কাজে তুমি বাইরে যাও তো প্রায়ই। কোনওদিন কিছু বেঠিক দেখেছ? .....
প্রচেত কী বলবে ভাবছিল।
দীপাই বলে — হ্যাঁ গো তোমার রাতে ঘুমটুম ভালো হয়েছিল? ..... খাওয়া-দাওয়া? নিশ্চয়ই অসুবিধে হয়নি?
— না। কোনও অসুবিধে হয় নি।
— ঐসব ছাইভস্ম বেশি গেল নি তো? বাইরে গেলে তোমার তো আবার লিমিট থাকে না .....।
প্রচেত কিছু বলে না। একধরণের আওয়াজ করে হাসে, যাতে তার হাসির আওয়াজ দূরভাষের মাধ্যমে দীপার কানে পৌঁছায়; সে ব্যাপারে বেশ সচেতন থাকতে হয় প্রচেতকে।
— আজ অফিস করে সন্ধ্যের দিকে বাড়ি ফিরব।
— আসানসোল থেকে ফিরতেই তো দুপুর হয়ে যাবে। আবার আজ অফিসেও যাবে?
— জিজ্ঞেস করে দীপা।
— হ্যাঁ। ...আসানসোল থেকে ফিরে অফিসে যেতে হবে একবার। বিকেলের দিকে একটা মিটিং আছে।
— ঠিক আছে। রাস্তাঘাটে সাবধানে থেকো।
— হ্যাঁ তুমিও সাবধানে থেকো। দরজায় লক্ লাগাতে ভুলো না। ও. কে.? ..... বাই .....।
প্রচেত নিজেই তার যন্ত্রটি 'অফ' করে দ্যায়।
মাথার ওপর ঘোরতর পাখা। তবুও যেন ঈষৎ ঘামের অনুভব। আসলেপ্রচেত ভয় পেয়েছে। দীপার সঙ্গে দূরভাষে কথা বলার সময় তার খেয়ালই ছিল না যে গতকাল অ্যাটাচি-হাতে বাড়ি থেকে বেরনোর সময় সে তার সরল স্ত্রী দীপাকে ডাহা মিথ্যে বলেছিল। সে বলেছিল অফিসের গুত্বপূর্ণ ওয়ার্কশপে তাকে একদিনের জন্যে যেতে হচ্ছে আসানসোল। এটা যে খুব নতুন ছিল প্রচেতের পক্ষে তা নয়। মিথ্যে তো দীপাকে প্রায়ই বলতে হয়। সেই মিথ্যে বিশ্বাস করার ব্যাপারেও দীপার কোনও সমস্যা নেই। প্রচেত জানে, দীপার চিন্তাধারা একমাত্রিক। অবশ্য প্রচেতের নিটোল — নিখুঁত মিথ্যেগুলো দীপা অবিশ্বাসই বা করে কীভাবে? ব্যাটারি-প্রস্তুতকারক এবং নামী এক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সেলস-ম্যানেজার যখন প্রচেত; তখন তো তার স্বাভাবিক কারণেই আজ দুর্গাপুর, কাল ব্যাঙ্গালোর, পরশু হলদিয়া, তরশু ধানবাদে গুত্বপূর্ণ অফিস-কনফারেন্স থাকতেই পারে। কোনও সময় থাকে না। কিন্তু তার ব্যস্ত অফিস-জীবনের এরকম এক বাড়ি-ছেড়ে-রাত-কাটানোর সুযোগ প্রচেত প্রায়ই ব্যবহার করে অদিতির সঙ্গে তার এই অলীক, বানানো জীবনের অবৈধ উপভোগের ক্ষেত্রে। যেমন গতকাল প্রচেত দীপাকে বলেছিল বটে আসানসোল যাচ্ছে। কিন্তু বস্তুত সে কলকাতা ছাড়েই নি। রোজকার মতন অফিস। তারপর ছুটির পর (যখন সন্ধ্যের ট্রেনে তার আসানসোল যাওয়ার কথা) চলে এসেছিল যোধপুর পার্কে অদিতির

ফ্ল্যাটে। যেরকম মাঝেমাঝেই আসে।
প্রচেত আবার সোফায়। তার দু-আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। অদিতি আবার এ-ঘরে। বাসি নাইটি ছেড়ে আক াশনীল হাউসকোট এখন অদিতির।
সে বলে — বউয়ের সঙ্গে প্রায়ই এরকম ডিসেপসন্। ..... তোমার কনসেন্সে প্রিক্ করে না প্রচেত?
— কনসেন্স? — নিঃশব্দে হাসছে প্রচেত। — কে কাকে বলছে? প্রচেতের সিগারেটে ধোঁয়ার রিং। কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়ে শূন্যে ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে রিং। প্রচেতের মনেও কথাগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে প্রকাশ করছে না। প্রকাশ করলে অদিতি বাস্তবিক লজ্জাই পাবে।
... তুমি অদিতি ... তোমার মুখে বিবেকের কথা? .... তোমারও তো ভালোমানুষ স্বামী গান্ধীনগরে একই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সিটি-ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। তোমার একমাত্র ছেলে নরেন্দ্রপুর হোস্টেলে। আর তুমি এই ফ্ল্যাটে পরপুষের সঙ্গে (নিশ্চয়ই শুধুই আমি) রাত কাটাচ্ছ। তাকে বসতে দিচ্ছ। খেতে দিচ্ছ। শুতে দিচ্ছ। তোমার মহার্ঘ শরীরে দেশলাই জ্বালতে দিচ্ছ আমাকে। এ জন্যে অপরাধবোধে, কোনও নির্জনতম মুহূর্তে তুমিও কী রক্তাক্ত হও? কেন এই অবৈধ জীবন আমাদের অদিতি? সে কী শুধু আমরা দুজনে পুরনো প্রেমিক-প্রেমিকা তাই? নাকি এই অবৈধ জীবন বেঁচে থাকার অন্য আস্বাদ...?
— একটা সিগারেট নিচ্ছি তোমার প্যাকেট থেকে। তামাকের গন্ধটা এ্যাতো সুদিং আমারও স্মোক করতে ..... প্রচেতের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট। লাইটারে মিষ্টি বাজনা। অদিতি টান দিচ্ছে সিগারেটে। প্রচেত চোখ ফিরিয়ে নেয়। এ কথ াটা সে কোনওদিনই বলতে পারবে না অদিতিকে। কিন্তু এটা ঘটনা যে, মেয়েদের সিগারেট টানতে দেখলে তার কান-মাথ া ঝাঁ ঝাঁ করে।
— কনসেন্স বলতে তুমি ঠিক কী বোঝ — অদিতি?
— কনসেন্স? — হাসে অদিতি। — এখনও মনে আছে।
— কী?
— তখন আমার ১৫ কি ১৬; — একটা নাটক দেখেছিলাম। ..... তখন এমন একটা বয়স যা কিছু দেখি ভাল লাগে। ..... তো আমাকে বেশ ইমপ্রেস করেছিল নাটকটা।
— কী রকম নাটক?
— একজন মানুষ সন্দেহ করে তার স্ত্রী অন্য পুষের সঙ্গে শোওয়া-বসা করে। তার স্ত্রী কিন্তু ওরকম নয়। কিন্তু লোকটা সন্দেহ করে।
— ইনটারেসটিং!
— এরকম মিথ্যে সন্দেহের কারণেই লোকটা তার স্ত্রীকে খুন করে। খুন করার পর রাত হলেই পরনে পায়ের পাতা অব্দি জোববা, ধবধবে সাদা লম্বা দাড়ির একজন বৃদ্ধ, এগজ্যাকট্ রবীন্দ্রনাথের মতন দেখতে, ঐ খুনী লোকটার জানলায় এসে দাঁড়ায়। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে লোকটা।
বুড়োকে জিজ্ঞেস করে — কে তুমি ? আর বুড়ো নিঃশব্দে হাসেন। কোনও উত্তর করে না। ..... বিবেকের কথা ভাবলেই আমার কত বছর আগে দ্যাখা ঐ নাটকটার কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মতন দেখতে ঐ বুড়োটাই ছিল খুনী লোকটার বিবেক তাই না?
এবার অদিতিও সিগারেটের ধোঁয়ায় নিখুঁত রিং বানাচ্ছে। অদিতির কথায় বাস্তবিক হাসতে হয় প্রচেতকে।
— তাহলে বিবেক বলতে তুমি এটাই বোঝ জোববা-পরনে, একমুখ দাড়ি একটা বুড়ো.....?
— আবার কী? ওসব থাক প্রচেত। উনিশ শতকের জ্ঞানবৃদ্ধদের মতন কথা বোলো না। .... বিবেক আবার কী? মানুষের যা ভাল লাগে মানুষ তাই করবে। এটুকু স্বাধীনতা মানুষের থাকবে না? আমাদের এই সম্পর্ক নিয়ে তোমারই প্রিকিং কনসেন্স বেশি — তাই না ?
প্রচেত কোন উত্তর দ্যায় না। তার সিগারেট শেষ। সে হাই তোলে।
— আসলে ব্রেক-ফাস্ট হয়নি এখনও। তোমার খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার নিয়ে আসি।
— অন্য খাবার নয়। তোমকেই খেতে চাই — । — প্রচেত সোফা থেকে উঠে পড়ে। অদিতির নির্মেদ, স কোমর জড়িয়ে

ধরে। নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দ্যায় অদিতির পাকা আঙুরের মতন টস্‌টসে ঠোঁটে।
— উমমমমম্ ..... কী হচ্ছে? আমাকে বারবার খেয়েও সাধ মেটেনা? ..... তোমার এ্যাতো খিদে প্রচেত। তোমার বউ বোঝে না? শুধু ঠাকুরঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাবে। বাবা লোকনাথের ক্যাসেট শুনবে। শনিবারে কালীঘাটে যাবে পুজো দিতে। আর তুমি উপোসে শুকোবে। তারপর আমার কাছে এসে —
— বিবেকের প্রসঙ্গ যেমন তোমার পছন্দ নয়, বউ-এর প্রসঙ্গও আমার পছন্দ নয় অদিতি। আমি এখন.....
— এ্যাই — কী অসভ্যতা হচ্ছে ? — খিলখিলে হাসে অদিতি। প্রচেতের হাতের গতিবিধি ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। অদিতি শক্ত করে চেপে ধরে সেই লোলুপ হাত।
— সকালবেলা এরকম ছেলেমানুষি ভালো না। ..... শান্ত হও। স্থির হয়ে বোসো। ..... একটা কবিতা শোনাই তোমাকে — ।
— তোমার কবিতা? — প্রচেত আবার শান্ত হয়ে সোফায়।
— আমি তো কবিতা লিখতে পারি না। পড়তে ভালো লাগে।
— তোমার কবিতা পড়া মানে তো সেই শক্তি-সুনীল। ওরা এখন পুরোনো হয়ে গেছে ..... ।
— মশাই আমি আপনাকে নতুন কবির কবিতাই শোনাবে। এবারের বুক-ফেয়ার থেকে একজন কবির নির্বাচিত কবিতা কিনলাম। দুর্ধর্ষ কবিতাগুলো! .... অ্যাপ্রোচ, ইমেজারি সব অন্যরকম।
— কবির কী নাম?
— শক্তি-সুনীলের মতন পরিচিত নয়। তবে অনেকদিন লিখছে।
দাঁড়াও বইটা ও-ঘর থেকে নিয়ে আসি।
বই হাতে অদিতি এ-ঘরে।
— কবির নামটা বলবে তো?
— তুমি কোনও কবিকেই চেন না। কী হবে নাম বলে?
কবিতাটা পড়ছি শোন — । খুব মডার্ন।
কবির প্রতি অদিতির আবেগ নিখাদ। জানে প্রচেত। কিন্তু কবিতা সে কিছুই বোঝে না। বিশেষত আধুনিক কবিতা। কিন্তু অদিতিকে এখন থামানো যাবে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে শুনতে হয়।
অদিতি পড়ছে, ঈষৎ হাস্কি স্বরে —
কানে যে অবিরত বিপ বিপ শব্দ পাচ্ছেন
এটাই ডায়াল টোন।
সতর্ক আঙুলে সঠিক নম্বর ডায়াল কন।
অপরপক্ষ 'হ্যালো' বললে তবেই
অন্ধকার ফুটোর ভেতর ধাতব টাকা ফেলুন।
কথা বলা তিন মিনিটের মধ্যে শেষ কন।
কথা শেষ হলে।
রিসিভারটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে রাখুন।
অদিতি থামে।
— কেমন লাগল?
— কবিতার নামটা বললে না?
— কবিতার নাম — 'প্রেম' —। কিছুই বুঝলে না!
— শুধু দুটো লাইন বুঝেছি। — প্রচেত হাসছে।
— কোন লাইন দুটো?
— অন্ধকার ফুটোর ভেতর ধাতব টাকা ফেলুন ..... আর ..... কথা শেষ হলে রিসিভারটি যথাস্থানে ঝুলিয়ে রাখুন ....

কথা শেষে সত্যিই রিসিভারটি নিঃশেষিত, অবসন্ন এবং সংকুচিত হয়ে ঝুলতে থাকে .... । লক্ষ্য করেছ অদিতি? ....
— ওফ্ তুমি যা অসভ্যতা শু করেছো না? — এবার যেন প্রকৃত লজ্জা পায় অদিতি। লজ্জা পেয়ে সে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে। প্রচেতার চোখে তাকে, — অদিতিকে এখন অপরূপ ..... ।
১৪ এপ্রিল, ২০০১, সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট
সামনে ট্রাফিকের লাল চোখ। থেমে থাকা গাড়িতে বসে ঘামছিল প্রচেত। ড্রাইভারকে ফ্যান চালিয়ে দিতে বলল। মুখের স ামনে হাওয়ার ঝাপট। বাইরে ঝক্ঝক্ করছে রোদের দাঁত। সামনে চালিয়ে অগুন্তি গাড়ির সারি। পেছনেও। সবাই অপেক্ষা করছে কখন ট্রাফিকের লাল চোখ সবুজ ..... ।
— পেপার! পেপার! — থেমে থাকা গাড়ির সারির ফাঁক-ফোকর গলে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, হাড়গিলে এক বালক এগিয়ে অ াসছে। ডান হাতের ভাঁজে কাগজের তাড়া।
— এই পেপার — এদিকে —। ডাকল প্রচেত।
— কোন্ পেপার স্যার?
— দেখি ..... একটা ..... আনন্দবাজার .... ।
কাগজটা নিয়ে পয়সা দেবার মুহূর্তে লাল চোখ — সবুজ। প্রচেত পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে। খুঁজছে। গাড়ি ছুটছে। অদিতির বাড়িতে সে টেলিগ্রাফে খবরটা দেখেছে। বাংলা কাগজেও কী রিপোর্ট আছে? নিশ্চয়ই আছে। চলন্ত গাড়িতে বসে দ্রুত পৃষ্ঠা উলটে যায় প্রচেত। প্রথম .... দ্বিতীয় ..... তৃতীয় .... চতুর্থ .... এই তো! পঞ্চম পৃষ্ঠার একেবারে ধারের কলামে খবরটা 'একুশ বছরের যুবকের আত্মহনন' — বক্স-এ ছাপা খবরটা।
প্রচেত পড়ে —
ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের সদ্য ডিপ্লোমা পাওয়া যুবক তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই একটু বেশিরকম আবেগপ্রবণ। কোনও দুর্নীতির ঘটনায় তাঁর প্রতিত্রিয়া দেখে রীতিমতো বিস্মিত হতেন তাঁর বন্ধুরা। দিন সাতেক আগে তমালদের পাড়ার বিকল টেলিফোনগুলি ঠিক করতে গিয়ে টেলিফোনের লাইনম্যান যে ৫০ টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন তাতে তমাল এক বড় মানসিক ধাক্কা পেয়েছিলেন। বস্তুত সমাজের সর্বস্তরে অবক্ষয় নিয়ে এই যুবক খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। বন্ধুরা অবশ্য এসব নিয়ে হ াসাহাসি করেছে। কেউ ব্যঙ্গও করেছে। আবার কেউ বলেছিল, যা দিনকাল পড়েছে, এই দুর্নীতি, অবক্ষয়ের বিদ্ধে তোর একার পক্ষে লড়াই করা সম্ভব নয়। বরাবর পড়াশোনায় ভাল ছাত্র তমাল কিন্তু মানতে পারেননি বন্ধুদের এই যুক্তি। তমাল বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন, খিদে পেয়েছে বলে লাইনম্যান যদি কিছু টাকা চাইতেন দেওয়া যেত। কিন্তু কাজ করার জন্যে তিনি ঘুষ চাইবেন কেন? কয়েকদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগেছিলেন তমাল। গতকাল রাত নটা নাগাদ তমাল একা একা নিজের বাড়ির ছাদে উঠে যান। তারপর নিজের শরীরে কোরোসিন ঢেলে দেশলাই কাঠি জ্বেলে অগ্নিসংযোগ করেন। তাঁর চিৎকার শুনে ছুটে আসে বাড়ির লোকজন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তমালের মৃত্যু হয়। পুলিশ তঁ ার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্যে পাঠিয়েছে। ....
— অফিসে পৌঁছে গেছি স্যার। নামবেন না?
— হ্যাঁ। — প্রচেত খবরের কাগজটা মুড়ে অ্যাটাচিতে রাখে। তারপর অফিসের মোজাইক সিঁড়িতে পা রাখে। এখন সে প্রথানুগ নিজের চারপাশে আত্মপ্রত্যয় ছড়িয়ে হাঁটছে। দশতলা অফিসবাড়িতে লিফট্ থাকলেও প্রচেতের প্রয়োজন হয় ন া। কারণ তার অফিস দোতলায়। সুতরাং সিঁড়ি। সিঁড়ির ডানদিকে রিসেপশান।
— গুড মর্নিং স্যার! — ঝকঝকে, মোহিনী-চেহারা রিসেপশনিস্ট। সালোয়ার কামিজ বা ট্রাউজার-টপে এই মহিলাকে দেখতে অভ্যস্ত প্রচেত। কিন্তু আজ ওর হলুদ শাড়ি। অনেক প্রস্ফুটিত সূর্যমুখীর ভিড় সেখানে।
— গুড মর্নিং। — ভদ্রতাবশত বাও করতে হয় প্রচেতকে। তারপর সে সিঁড়ি ধরে উঠে যায়।
ঘূর্ণি-চেয়ারে বসে টেবিলে পি.এ.-র খুলে এনগেজমেন্ট-প্যাডে দ্রুত চোখ চালায় প্রচেত। বেলা ২টো-য় একটা গুত্বপূর্ণ মিটিং। .... কী নিয়ে যেন? .... মাথার ভেতরে কীরকম জমাট কুয়াশা অনুভব। যেন শীতের সন্ধ্যেয় প্রচেত একা একা নির্জন নদীর ধার দিয়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটছে। মাথার ওপরে ঝুলে আছে কুয়াশার ছায়াপথ। .... মিটিং-এর বিষয় কী? পি. এ.-র সঙ্গে কথা বলা যাক।

ইনটারকম-এর বোতাম টেপে।
— স্যার কিছু বলছেন? — পি. এ. — মোহিতবাবুর গলা।
— আজ ২টোর মিটিং কী নিয়ে যেন .....
— হলদিয়া ডিভিশনে ডিলারশিপ ....
— হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। থ্যাঙ্ক ইউ।
টেবিলে ফাইলের স্তুপ। কিন্তু কীরকম অবসাদ ....। চুপচাপ বসে থাকে প্রচেত। সাদা উর্দি পরনে আর্দালি কফি দিয়ে যায়। কফিতে চুমুক। সিগারেটও ধরায়। আজ মনটা অনেক পেছনে হাঁটতে চাইছে। ....অনেক পেছনে। তা প্রায় ২৫ বছর আগে। যখন আমি ২২ বছরের যুবক। তখনও চাকরি পাইনি। অথচ কলেজ-পর্বও শেষ। প্রচেতের মন দ্রুত পেছনে হাঁটছে। ছবিগুলো স্মৃতির অ্যালবামে এখনও এ্যাতো স্পষ্ট! এর আগে কোনদিন তেমনভাবে স্মৃতি হাতড়ায়নি প্রচেত। আজ তমাল বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মহত্যার খবর পড়ে তার নিজের জীবনের একটা ঘটনা মনে পড়েছে। হুবহু ২৫ বছর আগেকার সেই বিকেল, কিংবা সন্ধে নিজের চোখের সামনে স্পষ্ট, হতে দেখছে প্রচেত।....
তুমি তমাল, মাত্র ২১ বছরের তমাল, কেন করলে এই ভুল? মাত্র ৫০ টাকা ঘুষ চেয়েছিল অল্প মাইনের লাইনম্যান। নিজের শরীরে কেরোসিন ঢেলে জ্বলন্ত দেশলাইকাঠি ছুঁড়ে দেবার শুধু এটাই কারণ? কত সম্ভাবনাময় ছিল তোমার জীবন। হয়তো ২১ বছরের সব যুবকের যেমন থাকে, — স্বপ্ন উচচাশা ছিল, প্রেম ছিল তোমারও মনে। কিন্তু এই পৃথিবীতে, ঝিায়নের এই প্রবল ইঁদুর-দৌড়ে আবেগের কতটুকু দাম আছে? অতটা আবেগপ্রবণ আর অভিমানী হয়ে তুমি কতদূর যেতে পারতে তমাল? একদিন না একদিন লুকিয়ে থাকা ডুবোপাহাড়ে ঠিক ধাক্কা খেত তোমার সাবমেরিন। মাত্র ৫০ টাকা ঘুষ!....
প্রচেত সিগারেট ধরায়। চেয়ার থেকে উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। অন্যমনস্কভাবে নীচে তাকিয়ে দ্যাখে ব্যস্ত জনপথ। গাড়ির সারি। অগুন্তি মানুষের মাথা। সবাই ছুটছে দিশাহারা যেন। কোথায় ছুটছে? আকাশ খোলা। রোদ এখনও তীব্র। দুটো চিল বেশ ওপরে চক্রাকারে উড়ছে। ওরা কী পরস্পরের প্রতি অনুরাগী? ওরা কী এই দহনবেলায় হৃদয় খুঁড়ে জাগাতে চায় বেদনা?....
....কতদিন হয়ে গেল? .... সে অনেক দিন। অনেক বছর। ২৬ বছর আগে আমার ছিল তোমার মতনই বয়স। কী দু-এক বছর বেশী। আমি তখন এম. এস. সি. — ফাইনাল ইয়ার। তখন চুটিয়ে প্রেম করতাম অন্য এক মেয়ের সাথে। সে দীপা কিংবা অদিতি নয়। অন্য একজন। সে এখন কোথায়? ... জানি না। একদিন কী ঘটেছিল জানো? তমাল? আমরা আমি, আর সেই মেয়েটি এক সুন্দর সন্ধ্যায় বসেছিলাম নির্মীয়মান এক ফ্লাই-ওভার ব্রিজের এক ধারে, — আধো আলো এবং আধো অন্ধকারে। প্রেমিক-প্রেমিকারাই বসত সেখানে। বুড়োদের জটলাও থাকত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আমরা শুধু গল্পই করেছিলাম। আর কিছু না। গল্প করতে করতে খেয়ালই ছিল না কখন সন্ধে অনেকদূর গড়িয়ে গিয়েছিল। চারপাশ নির্জন। আশেপাশের অন্য প্রেমিক-প্রেমিকারাও কেটে পড়েছে কখন। একটা কালো ভ্যান ঝাঁ করে এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের সামনে। কয়েকজন পুলিশ লাফিয়ে নেমেছিল।
ইউনিফর্ম-পরনে একজন বিশ্রীভাবে জিজ্ঞেস করেছিল — এখনও বাড়ি যাবার সময় হয়নি? ফুর্তি মারা হচ্ছে? মাগী নিয়ে ফুর্তির সুযোগ থাকলে বাড়ি ফেরার কথা অবশ্য মনে না থাকারই কথা ...।
— ভদ্রভাবে কথা বলুন। — ফুঁসে উঠেছিলাম আমি। — আমরা তো শুধু কথা বলছিলাম —
— চোপ শালা! পুলিশকে ধমকাচ্ছে? পোঁদে হুড়কো ঢুকিয়ে! থানায় চল ওস্তাদ! .... আপনিও চলুন মাডাম — ।... আমার বান্ধবী, — ধর তার নাম বীথি, — আমার এক হাত চেপে ধরেছিল। প্রবলভাবে কাঁপছিল তার হাত!
— ঝিাস কন — আমরা ভদ্র-পরিবারের। — কাঁপা গলায় বলছিলাম আমি। — আমি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। ও স্কুলে পড়ায়।
— বাঃ — দুজনেই তো বেশ শিক্ষিত? — অফিসার রসিকতার ঢং-এ বলছিল। —ব্রিজের মুখে সরকারি সাইনবোর্ড পড়েন নি?
— সাইনবোর্ড?

— হ্যাঁ। ওতে লেখা আছে — সন্ধে ৬-টার পর ব্রিজের ওপরে থাকা বারণ। এটাতো এখনও আন্ডার কনস্ট্রাকসন। তো এখন কটা বাজে স্যার? সন্ধে ৬টা বেজে ৪০ মিনিট।

— এবারকার মতন ছেড়ে দিন। ভুল হয়ে গেছে। — নিজের গলা আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। — প্লীজ-স্যার-প্লীজ পার্ডন আস .....!

— দাঁড়ান। ওরকম ড্রামা করবেন না। একটু আলোচনা করে দেখি আমার কলিগদের সঙ্গে।

বোধহয় ৫ মিনিট। আমার কাছে মনে হয়েছিল — ৫ঘন্টা। আইনরক্ষক সেই অফিসার তার ৩ জন সহকর্মীর সঙ্গে নীচু স্বরে কী যেন আলোচনা করছিল।

অফিসার ডেকেছিল আমাকে — এদিকে আসুন তো ....।

আমি এগিয়ে গেলাম।

— শুনুন আপনারা যে ভদ্র তা বুঝেছি। লোক চিনতে আমাদের ভুল হয় না।

— তাহলে আমরা যেতে পারি?

যাবেন তো নিশ্চয়ই। শুধু শুধু থানায় নিয়ে যাব কেন? তবে শনিবারের বাজার। কিছু খরচাপাতি কন? .... অফিসার হাসছিল।

— খরচাপাতি?

— ৪জন আছি। মাথাপিছু ২৫ টাকা করে ১০০ টাকা দিয়ে যান।

— ১০০? — পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে ফেলেছিলাম আমি। গুনছিলাম নোটগুলো। — অত টাকা তো নেই স্যার। ৮৫ আছে। ৮০ নিন। .... ৫ টাকা বাসভাড়া, রিকশভাড়া .....।

— ঠিক আছে ৮০-ই দিন। কদিন প্রেম করছেন? পকেটে এত কম টাকা নিয়ে প্রেম করে? ম্যাডাম কী ভাববেন? — আবার দাঁত বের করে হেসেছিল অফিসার। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি ৩ জনও হেসে উঠেছিল। পোড়া ডিজেলের কটু গন্ধ ছড়িয়ে ভ্যান মিলিয়ে গিয়েছিল দূরে।

বীথি বলেছিল — ইস্! পুলিশকে ঘুষ দিতে হল! ঘেন্না করছে!

— কি করব? যদি থানায় নিয়ে যেত?

— যেতাম। আমরা তো কোনও অপরাধ করিনি। শুধু এখানে বসে গল্প করছিলাম। আচ্ছা — চল তো দেখি — সাইনবোর্ডে কী লেখা আছে? ব্রিজের এমাথা থেকে ওমাথা হেঁটেও কোথাও কোনও সরকারি নিষেধাজ্ঞা বা ঐ-ধরণের সাইনবোর্ড খুঁজে পাওয়া গেল না। বীথি বলেছিল — ইস্! পুলিশকে ঘুষ দিতে হল? না হয় থানায় যেতাম। তোমার মনের জোর এত কম প্রচেত? ..... না। বীথি আসেনি আমার জীবনে। দীপা এসেছে। দীপা বড় সরল। বোকাসোকা। আমার অফিসের উঁচু পদ এবং সামাজিক প্রতিপত্তি নিয়ে দীপার খুব গর্ব। সে আমাকে একটুও সন্দেহ করে না। এই শহরে অদিতির সঙ্গে আমি প্রায়ই রাত কাটাই। শরীরের আরামে মশগুল হয়ে থাকি। কিন্তু দীপা কিছু বুঝতেই পারে না....।

আমার বদলে যদি তুমি ওরকম পরিস্থিতিতে পড়তে তাহলে কী করতে তমাল? ঘুষ দিতে? বোধহয় দিতে না। কালো ভ্যানে উঠে থানায় চলে যেতে হয়তো। তারপর থানা থেকে ফিরে এসে অন্ধকার ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে কেরোসিন ..... দেশলাই.... পিঁ পিঁ পিঁ! ইনটারকম বাজছে।

তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলতে হয় প্রচেতকে।

— হ্যালো ?

— স্যার-কনফারেন্স-মে সবাই ওয়েট করছে। আপনি এলেই মিটিং শু হবে। —পি. এ. বলল।

— ইয়েস। আমি আসছি। এখনই....।

প্রচেত দ্রুত অফিস-চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

১৪ই এপ্রিল, ২০০১, বিকেল ৪টে

মিটিং শেষ। নিজের টেবিলে আবার প্রচেত। একটা ফাইল বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল। আবার পিঁ পিঁ পিঁ .....।

— হ্যালো ?

— স্যার আপনার একজন ভিজিটর আছেন। — রিসেপশনিস্টের রিনরিনে গলা; — পাঠিয়ে দেব স্যার?
— ভিজিটরের নাম কী?
— সুরজিৎ চন্দ।
— হ্যাঁ। ..... হী ইজ মাই ফ্রেন্ড..... সেন্ডহীম প্লিজ —।
— ও. কে. স্যার।
অনেকদিন পর সুরজিৎ। বামপন্থী লেখক। নিজে একটা লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। পাজামা-পাঞ্জাবি। কাঁচাপাকা চাপদাড়ি। সামনের দিকে চুল পাতলা। তাই কপাল অনেক বড় মনে হয়। ঝোলা ব্যাগটা কাঁধ থেকে টেবিলে রেখে সুরজিৎ মাল বের করে কপালের ঘাম মোছে।
— আঃ — এ. সি ঘরে বসে আছিস। তোদের আরামই আলাদা।
প্রচেত হাসে। — বোস্ না তুই যতক্ষণ পারিস। কফি বলি?
— বল। .... কাজের কথাটা আগে সেরে নিই। আমার কাগজে বিজ্ঞাপনের জন্যে ৩টে ফর্ম দিয়ে গিয়েছিলাম?
— কিছুদিনের মধ্যে পেয়ে যাবি। কাগজ বেরচ্ছে কবে?
— এক মাসের মধ্যে। এবারে স্পেশ্যাল ইসু। থিম কী জানিস?
— না।
— বিজ্ঞাপনের ফর্মে লেখা ছিল। আমার কাগজে এবারের থিম — দলিত সাহিত্য ....।
— তাই? ..... বেশ ভাল বিষয়।
এভাবে কথা চলে। কফি আসে। কফিতে চুমুক দিয়ে সুরজিৎ বলে — শোন প্রচেত। এবারে আমার কাগজ ১৫ ফর্মা ছাড়িয়ে যাবে। বিজ্ঞাপন থেকে তোকে মিনিমাম ১০ হাজার টাকা .....
— হয়ে যাবে। ডোন্ট ওরি .....। নিজের লেখার খবর বল।
— আমার চতুর্থ উপন্যাস করেছি।
— বিষয়?
— বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন। ..... ঝাড়গ্রাম গিয়ে থেকে এলাম কিছুদিন। এবার ঝাড়খন্ড স্টেট-এ যাব। শিবু সোরেন ও অন্য নেতাদের সঙ্গে কথা বলব। সাধারণ আদিবাসীদের সাথেও কথা বলব। তারা কেমন আছে। নতুন রাজ্য পেয়ে কী ভাবছে — এদের সাক্ষাৎকার আমার উপন্যাসে জায়গা করে নেবে। এই লেখাটাতে ফর্ম নিয়ে অনেক ভাঙচুর থাকবে ....।
— তোর ব্যক্তিগত জীবনে কোনও সমস্যা নেই? — ফস্ করে জিজ্ঞেস করে প্রচেত।
— উপন্যাস লিখতে ঝাড়খন্ড স্টেটে যেতে হবে?
— ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা মানে? রগরগে সেক্স? এসব লেখার জন্যে অন্যেরা আছে। হট কেকের মতন সেসব বই বাজারে বিকোয়। সেসব তো আর সাহিত্য নয় .....।
— আজকের কাগজে এই নিউজটা দেখেছিস? ..... নিজের ব্রিফকেস থেকে সংবাদপত্র বের করে আত্মহননের খবরটার দিকে আঙুল দ্যাখায় প্রচেত।
— কি নিউজ আবার? — সুরজিৎ চোখ চালায়।
— ফুঃ — সেন্টিমেন্টাল ফুল! — রিপোর্ট পড়ে সুরজিৎ-এর মন্তব্য!
— কি বললি? — প্রচেত জিজ্ঞেস করে। ঝুঁকে পড়ে টেবিলের ওপর।
— বলছি যে এত সেন্টিমেন্টাল হলে আজকের যুগে চলা যায় না। এটা পেশাদারীত্বের যুগ। সমাজ থাকলে দুর্নীতি থাকবেই। প্রাচীন যুগেও ছিল। এখনও আছে। কিন্তু নিজে আত্মহত্যা করলে তো দুর্নীতি থামবে না। ..... বল — থামবে?
— তা হয়তো থামবে না। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, এরকম একটা অভূতপূর্ব ঘটনা তোদের মতন আঁতেল লেখকদের নাড়ায় না, ভাবায় না! ঝাড়খণ্ডীদের সমস্যা নিয়ে কিংবা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তোরা ভবিস, উপন্যাস লিখিস! কিন্তু পাশের বাড়িতে কি ঘটছে তার খবর তোরা রাখিস না। মাত্র ২১ বছরের এক যুবক জীবনের প্রতি

কতটা বীতশ্রদ্ধ হলে নিজেকে জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে দিতে পারে তা নিয়ে তোরা, লেখকরা ভাববি না কেন? .....
প্রচেতের কথায় সুরজিৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আরও বিস্তারিত তর্কে যেতে চায় সে। কিন্তু আবার ইন্টারকমে — পিঁ পিঁ ....। রিসিভার তুলে প্রচেত ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘর থেকে তলব পায়।
— আজ তাহলে এই পর্যন্ত? — প্রচেত হাসে। — বস্ ডাকছে।...
— এক সপ্তাহ বাদে আসছি।.... বিজ্ঞাপন ....
— হয়ে যাবে। — প্রচেত হাসে।
১৪ এপ্রিল, ২০০১, রাত ৮টা
ডোরবেল বাজাতে ফর্সা, গোল মুখে সরল হাসি ছড়িয়ে দরজা খুলল দীপা। হাত বাড়িয়ে প্রচেতের হাত থেকে অ্যাটাচি ধরে নেয়। বাধ্য, অনুগত স্ত্রী-র মুদ্রা।
— ভেবেছিলাম আর একটু আগে আসবে। পনির-কাটলেট বানিয়েছি তোমার জন্যে। তোমার ফেভারিট।
— সাড়ে সাতটার আগে তো অফিস থেকে বেরোতেই পারি না। এত কাজ।....শ্রেয়াকে দেখছি না?
— আজ তো ওর বন্ধু রিমির বার্থ-ডে। সেখানে গেছে।
— রিমি? এই হাউসিং-এ থাকে?
— হ্যাঁ। মি. সান্ন্যালের মেয়ে। বি ব্লকের তিন তলায় .....।
— ও.....। — নীচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলছে প্রচেত।
— এখন কি একবার চা খাবে?
— না। ..... একেবারে ফ্রেশ হয়ে।
চানঘর থেকে ফিরে পাজামা-পাঞ্জাবিতে বেশ ঝরঝরে লাগছে। কিচেন থেকে দীপা আসছে। তার ফর্সা কপালে গোল সিঁদুরের টিপ। ঘামের দু-একটা বিন্দু। দীপার সিঁথিও বরাবরের মতন বেশিমাত্রায় সিঁদুররঞ্জিত। ৩৫ বছরেই বেশ পৃথুলা দীপা। কিছুদিন আগে তার রক্তে ধরা পড়েছে চিনি। তাই নিয়ন্ত্রিত খাওয়া-দাওয়া দীপার। সে মাছ খায়। মাংস খায় না। লোকনাথ বাবার অনুরাগী। হপ্তায় একদিন উপোস দীপার। লোকনাথ-আশ্রমের বিধি অনুসারে। কোন্ দিন উপোস দীপ ার? শনিবার? না শুক্রবার? ... আজ কি বার? কী আশ্চর্য! আজকের তারিখ মনে আছে প্রচেতের। কিন্তু কী বার মনে পড়ছে না! .....
টেবিলে প্লেট নামিয়ে রাখে দীপা।
— দ্যাখো তো পনির-কাটলেট কেমন হয়েছে? টিভি-তে আজকে রান্নার অনুষ্ঠান হয়। তাই দেখে শিখেছি। প্রচেত ক াটলেটের অংশ ভাঙে। মুখে দেয়।
— অপূর্ব! তোমার হাতের রান্না কোনওদিন আমার খারাপ লেগেছে?
— যাক বাবা ! পরীক্ষায় পাশ! আর দুটো দি?
দীপা ছুটছে কিচেনে।
ডান-হাত বাড়িয়ে আরও ২টো কাটলেট প্রচেতের প্লেটে।
আর তখনই প্রচেত দেখতে পায় .....!
— তোমার কনুইয়ের কাছে এত বড় ফোস্কা! কি করে?
— পনির কাটলেট ভাজতে গিয়ে। — দীপা লাজুক হাসে। — কড়ার গরম তেলে যেই প্রথমটা ছেড়েছি তেল ছিটকে এসে লাগল!
— মাই গড! ..... দগদগ করছে। ..... কী লাগিয়েছো?
— বার্নল।.... ঠিক শুকিয়ে যাবে।
— গরম তেল ছিটকে চামড়ায় লাগলে ভীষণ যন্ত্রণা হয় — তাই না?
— তা একটু যন্ত্রণা তো হবেই।
— একটু তেল ছিটকে লাগলেই যন্ত্রণা! .... আর যদি সারা শরীরে আগুন ধরে যায়? — ফস করে প্রশ্নটা ছিটকে আসে

প্রচেতের কাছ থেকে!
— কী বলছ? — দীপা অবাক হয়ে প্রচেতের মুখের দিকে তাকায়। ঘামে তার সিঁদুরের টিপ ঈষৎ ধেবড়ে গেছে।
— সরি।.... কিছু মনে কোরো না। — প্রচেত নিজের ভেতরে কুঁকড়ে যাচ্ছে।....
১৫ এপ্রিল, ২০০১, রাত ২টো
ঘুম আসছে না কিছুতেই। অসহায়ভাবে প্রচেত বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ। পাশে — নিঃসাড়ে নিদ্রামগ্ন দীপা। মৃদু ফরফর শব্দে নাক ডাকছে দীপার।
মাথায় মৃদু যন্ত্রণা। চোখ জ্বালা। ঘনঘন হাই। ঘুম আসছে না কেন? নিদ্রাহীনতার রোগ প্রচেতের নেই। শরীর কী অত্যধিক গরম হয়ে গেছে? পরপর দু-গ্লাস জল খায় প্রচেত। সিগারেট? ..... না ধরানো ঠিক হবে না। তাহলে তো আরও ঘুম আসবে না।
শোবার ঘর থেকে পাশের ঘরে প্রচেত। মাথার ওপর পূর্ণ গতিতে পাখা। সোফায় গা এলিয়ে প্রচেত।
..... অন্ধকারে সে এসে দাঁড়ায়। তমাল। পোড়া দগদগে একটা মুণ্ড। চুল নেই। শুধু একটা বীভৎস গোলক। চোখ নেই তমালের। শুধু হাহাকারময় অন্ধকার ভর্তি দুটো কোটর। পড়ে শক্ত হয়ে যাওয়া এক কদাকার শরীর। তমাল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।
— তুমি কেন এলে তমাল?
উত্তর নেই।
তুমি কেন এলে...? কেন আমাকে বিরক্ত করতে এসেছ তমাল? আমি তোমার মতন 'সেন্টিমেন্টাল ফুল' নই। তোমার মতন সাহসও নেই আমার। ২১ বছরে যে সাহস থাকে।
..... আমি চালাক। পেশাদারের জীবন আমার। আমি আমার জীবনকে মেপে নিয়েছি কফি-চামচে। তুমি আমাকে বিরক্ত করতে এসেছ কেন? তুমি যাও তমাল। আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না।
পোড়া কাঠ একটা শরীর; বীভৎস গোলক, হাহাকারময় অন্ধকার ভর্তি দুটো কোটর তবুও প্রচেতের সামনে।
প্রচেত বিড়বিড় করছে .....
ভারি লরির চাপে গুঁড়িয়ে, ... থেঁতলে যাওয়া কোনও কুকুর বা বেড়ালের মুণ্ডু দেখেছ তমাল? ওরকম গুঁড়িয়ে, থেঁতলে, কেতরে মাটির সাথে মিশে পচে গলে গেছে কবে যেন — আমার বিবেক। আমি তোমার মতন মানুষ কোনওদিনই ছিলাম না বোধহয় — তমাল!
সেই মেয়েটির কাছ থেকে আমি পালিয়ে এসেছিলাম। যে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল — তোমার সাহস নেই? তুমি পুলিশকে ঘুষ দিতে গেলে কেন?
দীপাকে — আমি ঠকাচ্ছি প্রায়ই।
এমনকি অদিতিকেও আমি ভালবাসি না - তমাল। আমি তার অপরূপ শরীরকে তছনছ করি। এ কী ভালবাসা?
তমাল তোমাকে এই অন্ধকারে, নির্জনে চুপিচুপি বলি .....
আমি নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসতে পারি নি কখনও। তাই আমি কোনওদিন পারব না — অন্ধকার ছাদের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে জীবনের প্রতি ঘৃণায়, বিক্ষোভে একটা কেরোসিন বোতল অকম্পিত হাতে উপুড় করে দিতে নিজেরই শরীরে! তারপর একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি .....
তমাল — তুমি যাও — যাও!
ঘুমোতে দাও আমাকে।
প্রতিদিন একটু একটু করে আমাকে মরতে দাও .....

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com